ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কপ-২১ প্যারিস সম্মেলন উপলক্ষে জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে টিআইবি'র দাবি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ সহ দরিদ্র ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহে জলবায়ু পরবির্তনের প্রভাবে প্রতিনিয়ত ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন, খড়া ও তীব্র তাপমাত্রা অনুভূত হচ্ছে। ২০০৯ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান ফোরামের প্রতিবেদনে জানানো হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর প্রায় ১২৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে; অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার ৫০টি স্বল্পোন্নত দেশ বিশ্বের মোট গ্রিনহাউজ গ্যাসের মাত্র ১% নিঃসরণ করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২-৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে গেলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে অমোচনীয় (Irreversible) ক্ষতি হবে। আইপিসিসি'র ৩য় প্রতিবেদনে এ শতকের শেষে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১-৩ ফুট বেড়ে যাওয়ার আশংকা করা হলেও সর্বশেষ নাসার প্রতিবেদনে তা সর্বোচ্চ ৩ মিটার পর্যন্ত বাড়ার আশংকা করা হচ্ছে। আইপিসিসি'র তৃতীয় প্রতিবেদনে উপকূলীয় বন্যা, তীর ভাঙন এবং কৃষিতে বিপর্যয়ের প্রভাবে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় ৩ কোটি সহ বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৫ কোটি মানুষ পরিবেশ শরণার্থী হওয়ার আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ইউএনএফসিসি'র অনুচ্ছেদ ৩-এ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় শিল্পোন্নত এবং স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ ''সাধারণ কিন্তু স্ব-স্ব সক্ষমতার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বশীলতা (Common But Differentiated Responsibility)" নীতি মেনে প্রাক-শিল্পায়ন সময়ের তুলনায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমিত রাখবে এটাই বিজ্ঞানীদের দাবি এবং বিশ্ববাসীর প্রত্যাশাও বটে।

প্রত্যাশা ছিল কপ-২০ লিমা সম্মেলনে শিল্পোন্নত দেশসমূহ কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাসে আইনী বাধ্যবাধকতায় চুক্তির খসড়া প্রকাশ করবে কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি, উল্টো শিল্পোন্নত দেশসমূহ অবশ্য করণীয় নিঃসরণ হ্রাসকে প্রভাব খাটিয়ে স্বেচ্ছাধীন রাখার জন্য লিমায় গৃহীত সমঝোতা স্মারকের ৮নং ধারা যুক্ত করে প্রতিটি দেশের স্বেচ্ছায় নির্ধারণের ওপর ছেড়ে দিতে চুক্তির ভাষা "Shall" হতে "May" তে পরিবর্তন করে দায়কে অনুকম্পার বিষয়ে পরিণত করেছে। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রকৃত ক্ষতির মাত্রা আরো বেশি হতে পারে যদি কপ-২১ প্যারিস সম্মেলনে প্রস্তাবিত আইনী বাধ্যতার মধ্যে সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব না হয়। বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া সহ অ্যানেক্স-১ ভুক্ত শিল্পোন্নত দেশগুলো ছাড়াও বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের বড় অংশের জন্য দায়ী হলেও উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি চীন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারত এ্যানেক্স-১ ভুক্ত না হওয়ায় তারা ২০১৫ সালের প্রস্তাবিত আইনী বাধ্যতায় প্যারিস চুক্তিতে আগ্রহী নয়। অথচ সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা র্নিধারনের নিজেদের দায় এড়াতে ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে সব দেশকেই কার্বন হ্রাসের লক্ষমাত্রা নির্ধারণে INDC (Intended Nationally Determined Contributions) যুক্ত করছে। তবে আশার দিক হলো কিছু শিল্পোন্নত রাষ্ট্র ইতিমধ্যে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কপ-২১ সম্মেলন (Conference of the Parties-COP) কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সংক্রান্ত আইনী বাধ্যতায় চুক্তির ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশসমূহের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে বিশ্ববাসী।

এ প্রেক্ষিতে কোপেনহেগেন চুক্তির আওতায় শিল্পোন্নত দেশসমূহ দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিপূরণ হিসাবে ২০২০ সাল নাগাদ প্রতি বছর উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' শিল্পোন্নত দেশগুলো কর্তৃক অভিযোজন বাবদ ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিল প্রদানের কথা থাকলেও সম্ভাব্য ক্ষতির তুলনায় তা নগণ্য। স্বল্পোন্নত দেশগুলো ২০১৫ সালে কমপক্ষে ১৫ বিলিয়ন ডলার প্রদানের দাবি করলেও দাবি করলেও এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪.১ বিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে শিল্পোন্নত দেশগুলো। এ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়নের একটি পথনকশা (রোডম্যাপ) নির্ধারণের ব্যাপারে কোন অগ্রগতিও হয় নি। তাছাড়াও, জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা না থাকায় বেসরকারি খাতের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করছে যা সুস্পষ্টভাবে কোপেনহেগেন চুক্তির লংঘন।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (ইউনেপ) এর মতে, বিশ্বব্যাপী অভিযোজনের জন্য ২০২৫ সাল নাগাদ বছরে কমপক্ষে ১৫০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হলেও ক্ষতির ক্রমবর্ধমান মাত্রা অনুসারে তা বেড়ে বছরে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে দাড়াবে। জিসিএফ'র মাত্র ৫০ শতাংশ অভিযোজন এবং বাঁকি তহবিল প্রশমন বাবদ বরাদ্দ করা হবে, যা স্বল্পোন্নত ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের অগ্রাধিকার নয়। ২০১৫

সালের আগষ্ট পর্যন্ত সবুজ জলবায়ু তহবিলের (জিসিএফ) শিল্পোন্নত দেশগুলো মাত্র ১০.২ বিলিয়ন ডলার প্রদানের ঘোষণা দেয়। উল্লেখ্য, সবুজ জলবায়ু তহবিলে (জিসিএফ) এখন পর্যন্ত কোন প্রকল্প/কর্মসূচী বাবদ তহবিল বরাদ্দ করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে একইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অভিযোজনের জন্য সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) হতে কার্যকর অর্থায়ন এবং তহবিল প্রদান এবং ব্যবহারের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের মত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অভিযোজন কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানোই অনেকাংশেই অসম্ভব হবে। আমরা এমন একটি বিশ্বে বসবাস করি যেখানে আমাদের জীবন ও জীবিকাকে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা করা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে এই প্রক্রিয়ায় সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। তদুপরি, ২০১৪ এর আইপিসিসি'র সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে দারিদ্র হার আরো ১৫% বেড়ে যেতে পারে। আমাদের সংশয় এটাই যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় টেকশই উন্নয়নে সমন্বিত কর্মপন্থার অভাবে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ২০৫০ সালের মধ্যে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্য পূরণে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থে পরিচালিত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) গঠন করা হলেও ভবিষ্যত তহবিলের অনিশ্চয়তা রয়েছে। বাংলাদেশের অভিযোজন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতি বছর কমপক্ষে ১ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হলেও এ পর্যন্ত মাত্র ০.২ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে বাংলাদেশ এবং ২০১৩ সালের পর বিসিসিআরএফ এ নতুন কোনো তহবিল প্রদান করেনি। উল্লেখ্য, বিসিসিটিএফ হতে অনুমোদিত ২৩৬ টি সরকারি প্রকল্পে ২০৬৭.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও গত ৬ বছরে ২৩৬ টি সরকারি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৫৬টির কার্যক্রম (২৩%) শেষ হয়েছে; ৮৫টি প্রকল্প ২০০৯ সালের ৩০জুন শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এসব প্রকল্পের মাত্র ২০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তুপ্রায় ৭০-৮০ শতাংশ তহবিল উত্তোলন করা হয়েছে। টিআইবি গবেষণায় তহবিল অনুমোদন এবং ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি (যেমন, প্রকৃত ঝুকিপূর্ণ অনেক এলাকাতেই তহবিল প্রদান না করা), প্রকল্প প্রণয়ন এবং বা বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ না থাকার পাশাপাশি পরিবেশ, মানবাধিকার এবং আর্থিক মান নিশ্চিত না করায় জিসিএফ ছাড়ের প্রথম থেকে সরাসরি তহবিল প্রাপ্তির যে সম্ভাবনা ছিলো সে সুযোগ হতে বাংলাদেশ বঞ্চিত হতে পারে। ২০১১ সালের জিসিএফ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই টিআইবি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশগ্রহণের পাশাপাশি আর্থিক, পরিবেশগত এবং মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার নিশ্চিতে সরকারকে নিয়মিত সতর্ক করেছে। এ প্রেক্ষিতে টিআইবি নিম্নের দাবিসমূহ উত্থাপন করছি-

১. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় ব্যাপক ভিত্তিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে শিল্পোন্নত এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশ সমূহকে ইউএনএফসিসি'র 'সাধারণ কিন্তু সকলের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বশীলতা' নীতির আওতায় ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কপ-২১ সম্মেলনে আইনী বাধ্যতার মধ্যে চুক্তির যৌথ লক্ষ্য অর্জন;
২. কপ-২১ সম্মেলনে 'দুষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ' নীতির আওতায় কোনো অবস্থাতেই ঋণ নয় শুধুমাত্র অনুদানকে স্বীকৃতি দিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং একইসাথে কোপেনহেগেন চুক্তির আওতায় দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়নের একটি পথনকশা (রোডম্যাপ) নির্ধারণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণয়নে বাংলাদেশের জোরালো অবস্থান গ্রহণ;
৩. জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ সকল ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অভিযোজন পরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন এবং জিসিএফ হতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে তহবিল প্রদানে অভিযোজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে উন্নয়ন সহায়তার "অতিরিক্ত" ও "নতুন" তহবিল হিসাবে অনুদান হিসাবে দ্রুত ছাড়;
৪. জিসিএফ ও অন্যান্য উৎস হতে জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনায় যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহকে কাঙ্খিত স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর প্রস্তাব পেশ করা;
৫. জলবায়ু অর্থায়নে কাঙ্খিত অভিযোজনের মাধ্যমে টেকশই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, তহবিল বন্টন, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী সহ নাগরিক ও সুশীল সমাজের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৬. আর্থিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করে জিসিএফ হতে সরাসরি তহবিল গ্রহণে দ্রুত এক বা একাধিক জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এনআইই) নির্ধারনে বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সুস্পষ্ট ও কার্যকর পরিকল্পনা পেশ করা;

৭. জলবায়ু তহবিলের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে জলবায়ু তহবিল প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয় পক্ষকে আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন স্বেচ্ছায় প্রকাশ সহ আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমুহ হতে তহবিল ছাড় এবং সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইউএনএফসিসি'র আওতায় একটি নিবন্ধিত দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা;

৮. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় টেকশই উন্নয়নে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ২০৫০ সালের মধ্যে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্য পূরণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষ হতে ইউএনএফসিসি'র সাথে ইউএনআইএসডিআর এবং এসডিজিএস প্রক্রিয়ার সমন্বয় কিভাবে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা;

৯. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগের প্রভাবে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সক্ষমতার জন্য কানকুন চুক্তি ২০১০ এর আলোকে নীতিমালা প্রণয়ন, বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির মোড-৪ এর আওতায় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং জিসিএফ ও অন্যান্য উতস হতে অভিযোজন বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থায়নে জোর দাবি জানাতে হবে বাংলাদেশকে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর শুধু তত্ত্ব নয়, জীবন ও জীবিকার ওপর তা সরাসরি প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষকরে ব্যাপক কার্বন নিঃসরণ এবং অভিযোজন বাবদ তহবিল ক্ষতিপূরণ হিসাবে দ্রুত প্রদানে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে যথাযথ তথ্য ভিত্তিক ও দক্ষতার সাথে কপ-২১ সম্মেলন জোরালো ও কার্যকর অবস্থান তুলে ধরতে হবে। উল্লেখ্য, এটি কোন দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি নয় যে, পরে সুবিধামত সংশোধনের সুযোগ থাকবে। জীববৈচিত্র্য রক্ষাসহ সকল মানুষের জীবনমানের টেকসই উন্নয়নে প্যারিস সম্মেলন একটি মাইলফলক হয়ে থাকতে পারে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হতে বিশ্বকে রক্ষায় ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে সকল পক্ষ সাক্ষর করবে এ প্রত্যাশায় বিশ্ববাসী গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। বরাবরের ন্যায় কপ-২১ সম্মেলনে বাংলাদেশের যথাযথ দায়িত্ব পালনের সাথে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন এবং জীবিকাও জড়িয়ে রয়েছে।